দুনিয়ার মজদুর এক হও

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক
বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক
বাংলাদেশ গড়ে তোল

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
নির্বাচনী ইশতেহার

প্রকাশকাল
২৪ নভেম্বর ২০১৮

প্রকাশক
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

সহযোগিতা
পার্টি স্কুল

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং
কাঁটাবন, ঢাকা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক
বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক
বাংলাদেশ গড়ে তোল

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমাসন্ন। দেশের জনগণ এখন নির্বাচনমুখী। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে এই নির্বাচন কেবল ভোট প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়। এই নির্বাচনের ভোট নির্ধারণ করবে ১৪ দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে, গণতন্ত্র ও জাতীয় বিকাশে অগ্রগতি সাধন করেছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, নাকি বাংলাদেশ আবার বিএনপি-জামাত যুগের দুঃশাসন, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদের অতলান্ত অন্ধকারে ডুবে যাবে। বাংলাদেশ যাতে এগিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে। নির্বাচনসহ গণতান্ত্রিক বিকাশ, উন্নয়ন সব প্রশ্নেই তারা তাদের নোংরা নাক গলাতে দ্বিধা করছে না। বিএনপি-জামাতকে ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করতে তারা সব শক্তিকে এক করেছে। নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের কথা বলে এই শক্তিসমূহ নির্বাচন বানচাল করে অসাংবিধানিক শক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য তাদের পুরোনো প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আর সেটা এখনও সম্ভব না হওয়ায় তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে জনমনে আস্থাহীনতা তৈরি করে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি ও অশান্তি জিইয়ে রাখতে চায়। এ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে এই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও দৃঢ় নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

বাংলাদেশ দশ বছরে এগিয়েছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, জেল হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধের বিচার, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার ও সর্বশেষ একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার বিচার জাতিকে অনেকাংশে কলংকমুক্ত করেছে। বিচার হয়েছে খালেদা জিয়া, তারেকসহ ক্ষমতা মদমত্ত ব্যক্তিদের দুর্নীতির। বিচার হচ্ছে হলমার্ক, ডেসটিনি, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, ক্রিসেন্টসহ ব্যাংক জালিয়াতি, জনগণের টাকা লুটপাটকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দুর্নীতির। অভিযান চলছে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫২ ডলারে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৭% শতাংশ অতিক্রম করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে। বয়স্ক, বিধবা, অসচ্ছল মহিলা, প্রতিবন্ধী, নদী ভাঙ্গনে বিপদগ্রস্ত মানুষ, বেদে, হিজড়া, দলিত, চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুঃস্থ মানুষরা ভাতা পাচ্ছে, পাচ্ছে শিক্ষা উপবৃত্তি, কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ। দারিদ্র্যের হার নেমেছে ২২ শতাংশে। যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পদ্মা সেতুর ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন। সারা দেশ জুড়ে চলছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার।

কিন্তু এই উন্নয়নের অনুষঙ্গ হিসেবে বেড়েছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য। দেশের গিনিসূচক এখন ০.৪০ এর উর্ধ্বে। দেশের উঁচুতলার ১০ ভাগ মানুষের হাতে সম্পদ আয়ের প্রায়

২৭ শতাংশ ও নীচুতলার ১০ ভাগ মানুষের হাতে মাত্র ৩.৮৫ শতাংশ। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নেই। প্রকৃত সক্ষম বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। ঘুষ ছাড়া চাকরি পাওয়া দুষ্কর। দুর্নীতি এখন সর্বগ্রাসী। ক্ষমতার দাপট, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি, সন্ত্রাস এ সময়ের সকল অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিস্তার ঘটছে। বিসর্জন দেয়া হচ্ছে সকল প্রকার আদর্শবাদ, নীতি-নৈতিকতা। তরুণরা আকৃষ্ট হচ্ছে মাদক ও জঙ্গিবাদে। ভোগবাদী প্রদর্শনবাদে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিতে এই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে নতুন সংসদ ও সরকারকে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পার্টি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসে গড়ে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে। দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছে। সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে সেই দেশপ্রেমিক জনগণের এমন একটি রাষ্ট্রই প্রয়োজন, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আরও উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াবে। জংগীবাদ, মৌলবাদ ও তাদের স্বাভাবিক মিত্র সাম্রাজ্যবাদের নয়াউদারনৈতিক শোষণকে পরাস্ত করবে, ন্যায্যতা-সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশের পথে দেশকে এগিয়ে নেবে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মত ১১শ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ঐক্য সংগ্রাম, ঐক্যের ধারায় ১৪ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে যেমন 'নৌকা' মার্কায় নির্বাচন করছে, তেমনি পার্টি প্রতীক 'হাতুড়ি' মার্কা নিয়েও নির্বাচনে লড়াই করছে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ৩ মার্চ ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচি বাস্তবে রূপ দেবার পাশাপাশি ওয়ার্কার্স পার্টি সংসদ ও সংসদের বাইরে ১৩ দফা লক্ষ্য পূরণের জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে।

১৩ দফা লক্ষ্য

(১) রাজনীতিকে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংস্কার করা।

(২) উন্নয়নের পাশাপাশি ধনী-দরিদ্রের ও গ্রাম-শহরের বৈষম্য যৌক্তিকহারে কমিয়ে আনা, দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলসহ অধিক দারিদ্রপীড়িত এলাকাসমূহের জন্যে বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সকল জেলায় অর্থনৈতিক জোন তৈরি করা ও জেলাভিত্তিক বাজেটের গণদাবি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা।

(৩) রাষ্ট্র, প্রশাসন ও অর্থনীতির সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধ, ব্যাংক জালিয়াতি, অর্থ পাচার ও ঋণ খেলাপী রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ব্যাংক ব্যবস্থাকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

(৪) বেকার যুবকদের নিবন্ধন ও নিবন্ধিত বেকারদের কর্মসংস্থান সাপেক্ষে বেকার ভাতা প্রদান করা। চাকরির বয়সসীমা ৩৫ বছর করা, যুবকদের মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা ।

(৫) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি ব্যবস্থা, ছাত্রাবাসসমূহে মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি কমিয়ে সাধারণ মানুষের সামর্থের মধ্যে আনা, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা, শিক্ষাখাতে জিডিপি'র ৪.৫% বরাদ্দ করা, নিয়োগসহ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অবসান করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল রোধের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া ও সর্বোপরি ২০১০ সালের শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করা, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ও অপসংস্কৃতি রোধের কার্যকর ব্যবস্থা করা।

(৬) ধর্মীয় ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদকে প্রতিরোধ করা। স্ব স্ব ধর্ম পালনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা, কোন অজুহাত ছাড়া শত্রু-সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইনের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

(৭) শহর ও গ্রামের কর্মজীবী নারীর কর্মসংস্থান করা, মজুরি বৈষম্য দূর করা। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের অত্যাচার ও বাল্যবিবাহ রোধ করা এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করা ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। শিশুদের রাজনীতি ও সহিংসতায় ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা।

(৮) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। গার্মেন্টস শ্রমিকদের মূল (বেসিক) মজুরি বৃদ্ধি করে মজুরির হার নির্ধারণ করা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আজীবন আয়ের সমান ও উচ্চতর আদালতের নির্দেশনানুসারে গঠিত কমিটির প্রস্তাবিত অন্যূন ১৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

(৯) কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নিশ্চিত করা, কৃষিপণ্য ও প্রাণীসম্পদ রফতানির জন্য অবকাঠামো গঠন করা, কৃষি উপকরণ সুলভ ও সহজলভ্য করা, কৃষি ঋণের দুর্নীতি ও হয়রানী বন্ধ করা, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ নিশ্চিত করা ও কৃষকের অভিযোগ বিচারে কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

(১০) ডিজিটাল ব্যবস্থাকে সর্বগ্রাহী ও ডিজিটাল ডিভাইড বা ডিজিটাল বৈষম্য (কম্পিউটার প্রশিক্ষিত ও কম্পিউটার অশিক্ষিত জনসংখ্যার ব্যবধান) কমানো ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

(১১) শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৩ ধারাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় ও ব্যক্তি মালিকানার ভারসাম্য রক্ষা করা, পরিবেশ রক্ষার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

(১২) বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনাহীনতা ও ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা। গ্যাস সম্পদ আহরণে বাপেক্সকে আরও সক্ষম করে তোলা।

(১৩) পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই ১৩ (তেরো) দফা লক্ষ্যের পাশাপাশি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে পার্টি তার ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচিও তুলে ধরছে।

২১ দফা কর্মসূচি

১। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

১.১। প্রতি নাগরিকের মানসম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। খাবারের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ও খাদ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা। গ্রাম-শহরের দিনমজুর, খেতমজুর ও নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

১.২। গণউদ্যোগ ও জনপরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশীয় ঐতিহ্য ও লাগসই প্রযুক্তি অনুসরণ করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাসহ চাল ডাল তেলসহ দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা। 'মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে বাজার তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ, ভেজাল খাদ্য প্রস্তুত, সরবরাহ ও বিপণন বন্ধ করে নিরাপদ খাবার তৈরি ও বিপণন নিশ্চিত করা। ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়ন করে ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি নিষ্কাশনসহ সকল প্রকার সেবার মূল্য সাধারণ মানুষের সঙ্গতির মধ্যে ও স্থিতিশীল রাখা।

১.৩। বাজার-সিন্ডিকেট অপরাধ চক্র সমূলে উৎপাটন করা, মজুদদারি কঠোরভাবে দমন করা।

২। কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা

২.১। কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য ক্রমান্বয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা। প্রাথমিকভাবে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ১০০ উপজেলায় খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে 'কর্মসংস্থান স্কীম' চালু করা এবং পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারিত করা। প্রতি বছর ন্যূনতম ১০% নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.২। দরিদ্র জনগণের জন্য বসতভিটা ও খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবাসহ ন্যূনতম বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২.৩। শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা আনা। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা।

২.৪। উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি ও হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা। দরিদ্র নিম্নবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প চালু করা। বস্তিবাসীর জন্য পৌর জীবনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। শহরের খাস জমি উদ্ধার করে সেখানে সরকারিভাবে কলোনি, ডরমিটরি ইত্যাদি নির্মাণ করে তা গরীব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ও বস্তিবাসীদের কাছে বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেয়া। বাস্তুহীন ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র সকল পরিবারের জন্য ৩ বছরের মধ্যে ন্যূনতম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩। কৃষক, খেতমজুর ও কৃষি সংস্কার ভূমিনীতি প্রসঙ্গে

৩.১। খোদ কৃষকের হাতে জমি এই নীতিমালার ভিত্তিতে ভূমি সংস্কার করা।

৩.২। জমির সিলিং ব্যবস্থার পুনঃসংস্কার করা। এক ফসল জমির ক্ষেত্রে জমির সিলিং ৫০ বিঘা এবং দো ফসলা জমির সিলিং ৩০ বিঘা নির্ধারণ করা সহ অকৃষক জমির মালিক, যাদের পরিবার কৃষি আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের জমি অধিগ্রহণ করা এবং উদ্ধারকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা।

৩.৩। বর্গা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, বর্গা চাষীদের বর্গাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বর্গা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা, উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে তেভাগা কার্যকর করা।

৩.৪। খাস জমি ও জলাশয় উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষক জনগণের মধ্যে বিলিবণ্টনের উদ্যোগ গ্রহণ, জলমহলগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে দেওয়া।

৩.৫। শিল্প-বাণিজ্য, রাবার বাগান করার নামে নামসর্বস্ব শিল্প মালিক, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের জমির লিজ বা ক্রয়ের অনুমোদন বাতিল করে কৃষি জমি রক্ষার ব্যবস্থা করা। আবাদী কৃষি জমিতে ইটের ভাটা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের আবাসিক প্রকল্প গড়ে তোলা আইন করে নিষিদ্ধ করা।

৩.৬। অল্প জমিতে অধিক আয়ের সংস্থান গড়ে তোলা। কৃষিকে ভিত্তি করো এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

৩.৭। খেতমজুর, দিনমজুরদের সারা বছরে কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা। বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প মঙ্গা, খরা, জলাবদ্ধ এলাকা ভিত্তি হিসেবে ধরে সারাদেশে তা সম্প্রসারিত করা, মজুরি ১০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ টাকা ধার্য করা এবং ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি কার্ড প্রদান করা। বয়স্ক ভাতা ও দুঃস্থ ভাতার টাকা দ্বিগুণ করা।

৩.৮। কৃষি নীতি

৩.৮.১। বাংলাদেশে কৃষি নীতি বলতে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালার আইনগত দিক, উৎপাদনে নীতিমালার দিক, উপকরণের দিক, উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ, লাভজনক মূল্য, সামগ্রিক দিকগুলো নিয়ে আমাদের দেশে কোন নীতিমালা নেই। যা আছে তাও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ সমস্ত দিকগুলোকে সামনে রেখে কৃষি নীতি নির্ধারণ করা।

৩.৮.২। আধুনিক কৃষি নির্ভর উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক সেচসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ, কৃষি উপকরণের ভর্তুকী বাড়ানো, উপকরণ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ ঢালাওভাবে ব্যক্তি মালিকানায় না দিয়ে বিএডিসিকে সচল করে তার নিয়ন্ত্রণে আনা।

৩.৮.৩। উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধান, পাট, আখ, তামাক, পানসহ প্রধান

ফসলগুলোর লাভজনক মূল্য পাবার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষি পণ্য সরাসরি ভোক্তার হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থাসহ বাজারজাত করানোর সমস্যাসমূহ দূর করা।

৩.৮.৪। গ্রামাঞ্চলে মহাজনী ঋণের ও এনজিও ঋণের খপ্পর থেকে কৃষি ও কৃষককে রক্ষা করার জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ, কৃষি ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের কৃষি ঋণের সরল সুদ ৫%, সেই সঙ্গে এনজিওদের ঋণের সুদ অনুরূপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র কৃষকদের ফসল অনুযায়ী বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া সহ মৌসুমী ঋণ ব্যবস্থা চালু করা।

৩.৮.৫। দেশীয় বীজ ভাণ্ডারকে রক্ষা, দেশীয় উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনের বীজ উদ্ভাবন, বন্ধ্যা বীজ ও জিএমও বীজ বাদ দিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার, কৃষি গবেষণাকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া।

৩.৮.৬। শস্য বীমা চালু করা, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতাসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষি খাতকে রক্ষা করার বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.৮.৭। হাট-বাজার, ঘাট, বিল-বাওড়, হাওড়সহ ইজারাদারি ও কন্ট্রাক্ট প্রথা বাতিল করা সহ হাট-বাজারে সরাসরি কৃষকদের বেচাকেনার ওপর তোলা বা খাজনা বন্ধ করা।

৩.৮.৮। কৃষি উৎপাদন স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন প্রতারণা, অপরাধ, দুর্নীতি দমনে কৃষি আদালত গঠন করা।

৩.৮.৯। অতি জনসংখ্যার এই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা, শিল্প, আবাসন ইত্যাদি দিকগুলোকে খেয়ালে নিয়ে কৃষি-অকৃষি জমি চিহ্নিত করে কৃষকের প্রতিনিধি, ভূমি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষকসহ সকলের মতামত নিয়ে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা সংশোধন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ চাষযোগ্য কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার বন্ধ করা।

৪। শিল্প, শ্রমিক ও কর্মচারি

৪.১। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা, রাষ্ট্রীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.২। বন্ধ করে দেওয়া পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকলসহ সকল বন্ধ কারখানা চালু করা, চাকুরিচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারিদের কাজ ও চাকুরিতে পুনর্বহাল করা সহ পাট শিল্পে বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার দখল ও বাস্তবসম্মত কার্যকরী বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৩। ব্যাংক, বীমা, টিএন্ডটি, বিদ্যুৎ মৌল ও ভারী শিল্পকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক ছোট, মাঝারি ও ভারি শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সকল গার্মেন্টস শিল্পকে একই জাতীয় শিল্প নীতিমালার অধীনে আনা।

৪.৪। ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ এবং আইএলও কনভেনশন পরিপন্থী সংশোধনী সমূহ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা। আইএলও কনভেনশনের সকল ধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া।

৪.৫। শ্রমিকদের (ইপিজেড এলাকাসহ) পরিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করা, আদালতে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করা নিষিদ্ধ করা।

৪.৬। গার্মেন্টসসহ সকল মিল কারখানায় ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস চালু এবং ওভারটাইম আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ মজুরি প্রদানের জন্য মালিক বা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা, বিনা মজুরিতে জোর করে ওভারটাইম করালে মালিককে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪.৭। বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ধরে নতুন বেতন ও মজুরি নির্ধারণ করা, মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৪.৮। নারী শ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি, ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৪.৯। প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ সেল প্রতিষ্ঠা করা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা। নির্মাণ শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক, গৃহশ্রমিক প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিরসন করা।

৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি

৫.১। জীবনমানের উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতিতে বিদ্যুতের কোন বিকল্প নেই। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতাপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৫.২। বাংলাদেশ-ভারত-ভুটান-নেপাল সহ এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলাসহ গ্যাস খাতে রাষ্ট্রীয় পরিপূর্ণ নিয়োগ সহ বাংলাদেশী গ্যাস কোম্পানি বাপেক্সকে আধুনিক প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিকমানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ গ্যাস ক্ষেত্রকে তাদের হাতে দেয়া। গ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রযুক্তির আরও আধুনিকায়ন করা।

৫.৩। বিদ্যুতের মূল্য না বাড়িয়ে বিদ্যুত খাতের দুর্নীতি রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

৬। সড়ক, রেল, বিমান, নৌ পরিবহনসহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৬.১। জনবহুল এই দেশে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনসসম্পৃক্তি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করণে সড়ক জনপদের ব্যাপক মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা। অগ্রাধিকার

ভিত্তিতে আন্ত জেলা মহাসড়কগুলোকে ৪ লেনে উন্নীতকরণসহ নতুন নতুন ফিডার সড়ক তৈরি করা হবে। দেশের সকল বন্দরের সঙ্গে সড়ক ও নৌ যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

৬.২। জরুরি ভিত্তিতে গণপরিবহন খাত উন্নয়নে রেলের কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা। নতুন নতুন রেলপথ বসানো। পুরাতন আন্তজেলা রেল লাইনকে ডাবল ট্রাক সহ বিদ্যুৎ নির্ভর ট্রেন লাইনে রূপান্তর করা। আন্ত মহাদেশীয় রেল সংযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকা। এই মুহূর্তে চলমান রেল ব্যবস্থায় প্রতিটি রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো। প্রতিটি মহানগরীকে ঘিরে সার্কুলারে রেলওয়ে, সাবওয়ে মেট্রোরেলের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৬.৩। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ আরও বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোকে খনন করে নৌ যাত্রী সেবা ও নৌ পথে পরিবহনের মাত্রা বাড়িয়ে সড়কের চাপ কমানো। নদী খননের জন্য দক্ষ জনবল সহ আন্তর্জাতিকমানের ড্রেজিং ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। নদী ড্রেজিং এ দুর্নীতি অপচয় বন্ধ করা।

৬.৪। জাতীয় পরিচয় বহনকারী 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' যুগপোযোগি করতে আধুনিক ব্যবস্থাপনা সহ দক্ষ জনবল, সক্ষমতা অর্জন, আন্তর্জাতিক মার্কেটে টিকে থাকার সামর্থ এবং নতুন ক্রাপট প্রতিনিয়ত পরিবহনে যুক্ত করা। অপচয় দুর্নীতি পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা। আগামী পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা অধীন করে দেশের প্রতিটি বিভাগে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সহ বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ জেলায় বিমান বন্দর নির্মাণ করা। অভ্যন্তরীণ বিমান ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ-যোগ্য করে সাশ্রয়ী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া। বেসরকারি বিমান খাতকে প্রণোদনা দেওয়া।

৭। সুষম উন্নয়নে নগরায়ন ও গ্রাম উন্নয়ন

৭.১। বিশ্ব পুঁজিবাদি ব্যবস্থার প্রান্তিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশও আয় বৈষম্য ধনবৈষম্যের শিকার। বুর্জোয়া লুটেরা শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফলশ্রুতিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাও শহর-গ্রামের পার্থক্য রচনা করেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও গ্রাম উন্নয়নের পশ্চাৎপদতার কারণে শহরের অভিবাসির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই ধারা বন্ধ করা। সেই লক্ষ্যে সুষম উন্নয়নের সুদূরপ্রসারি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। উন্নয়নের বিকেন্দ্রীয়করণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীয়করণের লক্ষ্যে শ্রমঘন শিল্প, কৃষি শিল্প, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিটি সেবা খাতের শহর গ্রামে বন্টন করা।

৮। আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

৮.১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়ানো। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ আইন দ্বারা অধিকারে পরিণত করা। জনগণ যাতে কোন ধরনের দরিদ্রতার কারণে বঞ্চিত বা শোষিত না হয়।

৮.২। আদিবাসী অধিকার প্রসঙ্গে: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করা। ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা। আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় বহন করার সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া। সমতলের আদিবাসী ভূমি সমস্যার সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন করা। সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করা। সমতলের আদিবাসীদের বিষয়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত করা।

৯। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিকাশ নিশ্চিতকরাসহ সার্বিক ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৯.১। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অর্জিত এই দেশের শত শত বছরের সংস্কৃতি বাহক সকল বর্ণ, ধর্ম, গোত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পক্ষপাত দুষ্টহীনভাবে রক্ষা করা হবে ও লালন করা হবে।

৯.২। মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে ঐ সকল জনগোষ্ঠীর সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, নাটক, জারিগান, সারিগান, লোকগান, চলচ্চিত্র, লোক ঐতিহ্য, মেলা, যাত্রাগান, লাঠিখেলা সকল ধর্মের জাতীয় উৎসব পালনের সকল বাধা দূর করে জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে তোলা। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এর নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া।

৯.৩। সকল ধর্মের জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা। বিশেষ কোন ধর্মের জন্য অন্যের ধমের্র অধিকার হরণ, বাধা প্রদান কঠোর হস্তে দমন করা। সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদকে চিরতরে নির্মূল করা ।

৯.৪। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের ধর্ম পালনে রাষ্ট্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৯.৫। বাংলাদেশের আত্মপরিচয় তুলে ধরতে এই জনগোষ্ঠির অতীত ইতিহাস সহ বর্তমান জাদুঘরের স্মৃতিতে ধরে রাখা হবে। জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সহ প্রত্নতাত্ত্বিক সকল নিদর্শন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিরাপদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৯.৬। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির নামে কোন রাজনৈতিক দল গড়তে দেওয়া হবে না। আইনের আওতায় তা নিষিদ্ধ থাকবে।

৯.৭। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিজ্ঞান মনস্ক চেতনা যেমন রক্ষা করতে হবে তেমনি সকল প্রকার কুপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

৯.৮। একটি সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তার সকল ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাকে জাতীয় সংস্কৃতির অধীন করে তা বিকশিত করে তুলতে হবে। প্রতিটি জাতীয় আন্তর্জাতিক খেলাধুলাকে পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। জঙ্গিবাদ মাদকের ছোবল থেকে তরুণ-তরুণীদের রক্ষা করতে বেশি বেশি করে শিশু বয়স থেকেই খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করাসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি

বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, কাবাডি, হ্যান্ডবল, সাঁতারসহ সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করে প্রকৃত খেলোয়াড় ও বোদ্ধাদের হাতে পরিচালনা করতে দিতে হবে। খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনীতির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানানো চলবে না।

১০। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানব সম্পদের উন্নয়ন

১০.১। জাতীয় শিক্ষা নীতি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহ সকল পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা নীতির অধিনস্ত করা।

১০.২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ কার্যকর করা।

১০.৩। সামাজিক সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাতে জনগণের মধ্যে মানবতাবোধ দেশপ্রেম গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অন্যায়-অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, জাগরিত ও প্রসারিত করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিকশিত করা। শিক্ষা কারিকুলামে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ঊর্ধে তুলে ধরা।

১০.৪। জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য বাজেটে অগ্রাধিকার প্রদান করা। দেশ ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রায়োগিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা-কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আত্মকর্মসংস্থান এবং বিদেশে চাকুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প সুদের ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

১০.৫। ছোট ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিষয়টিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদির ব্যবহার জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করা। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা।

১১। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আইসিটি খাত

১১.১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর সকল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে তোলা। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বেতন-ভাতা, চালান এবং সকল প্রকার প্রদেয় ফিসহ জনগণের সাথে সরকারি পর্যায়ের দপ্তরসমূহের আর্থিক লেনদেনে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালু করা।

১১.২। রপ্তানি বরাদ্দ ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিভাবন তরুণ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়ে সফটওয়্যার শিল্প ও আইটি এনাবল্ড (Enabled) সার্ভিসের বিকাশ সাধন করা।

১১.৩। ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের ইন্টার অপারেজিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য (National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়নের কাজ; দেশের ৭টি বিভাগে আইসিটি পার্কের (আইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর) কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করতে হবে।

১১.৪। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম বিকাশ এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা সম্বলিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১.৫। সকল নাগরিকের জন্য সমন্বিত নাগরিক ডাটাবেজ (National Population Register-NPR) তৈরি করা; এছাড়া সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া।

১২। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা নীতি পরিবার কল্যাণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

১২.১। সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার নীতিই হবে আমাদের লক্ষ্য। মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

১২.২। নগর ও গ্রামের স্বাস্থ্যসেবার বৈষম্য দূরীকরণসহ শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রামের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, সাধারণ সরকারি হাসপাতালের সুবিধা সেবা বৃদ্ধি করণ করাসহ ইউনিয়ন, আয়ুর্বেদ ও হেমিওপ্যাথি বাইওকেমিক সহ নানান ট্রাডিশনাল চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রসারিত করা।

১২.৩। জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তোলা, মেডিক্যাল টেকনোলজি, নার্সিংসেবা শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হবে। ইউনিয়ন, নগরের ওয়ার্ড ভিত্তিতে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

১৩। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ব্যবস্থা ও জনগণের সংসদ

১৩.১। আমাদের দেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের দাবি হচ্ছে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনকে আরও পূর্ণ ক্ষমতাসহ শক্তিশালী করতে হবে।

১৩.২। সংবিধানের অধীনস্থ হয়েই প্রতি টার্মে সুনির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন সম্পন্নসহ সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

১৩.৩। টাকার খেলা, পেশী শক্তির ব্যবহার, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, মুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহ সংসদে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৪। '৭২ এর সংবিধানে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে সংবিধানে বর্ণিত সকল বিধি, উপবিধিকে কার্যকর করতে আইন রচনা ও বাস্তবায়ন করে প্রকৃতভাবে জনগণের স্বার্থের সংসদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রাভিমুখী চেতনা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

১৩.৫। সংবিধানের ৭০ ধারা এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে সংসদ আরও গণতান্ত্রিক ও কার্যকর হয়। ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিধান করতে হবে যে, যাতে অনাস্থা ভোট, জাতীয় বাজেট পাশ ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন ব্যতিত সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করতে পারেন।

১৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন

১৪.১.১। সর্বস্তরে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানো, উপনিবেশিক আইনী কাঠামো সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করা হবে। গ্রাম আদালত থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও আইনী ব্যবস্থা জনগণের হাতের নাগালে থাকতে হবে।

১৪.১.২। সর্বোচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৪.১.৩। স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনকে আরও গতিশীল দায়িত্বশীল শক্তিশালী করে তোলা হবে।

১৪.২। ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন

১৪.২.১। তৃণমূলে জনতার ক্ষমতা এই গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে প্রশাসনিক পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করে ঐ সকল কাঠামোতে জনগণের অভিগম্যতা সহজতর করতে হবে।

১৪.২.২। স্ব, স্বশাসিত, আর্থিক সক্ষমতাসহ স্থানীয় সম্পদের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্থানীয় সরকার মুক্ত রাখতে হবে।

১৪.৩। যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা

১৪.৩.১। সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি সহ ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশে যেকোন সাম্প্রদায়িক উস্কানী কঠোরভাবে দমনে প্রয়োজনে বিশেষ আইন প্রণয়ন।

১৪.৩.২। সংবিধানের ১২ বিধির (ক) (খ) (গ) (ঘ) বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

১৫। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

১৫.১। মহান মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের জন্য যারা লড়াই করেছেন, জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই সকল বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ সম্মান, তাদের

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, দুঃস্থ- পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বার্ধক্যকালীন ভরণপোষণ চিকিৎসা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরি-কোটা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের 'সম্মানিত নাগরিক' হিসেবে রেল, বাস, লঞ্চে বিনামূল্যে ভ্রমণ সুবিধা ভোগ করবেন।

১৫.২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গৌরব রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সর্বক্ষেত্রে উর্ধে তুলে ধরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সকল স্মৃতি সংরক্ষণে যেমন-গণকরব, বধ্যভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদি সকল জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভ, সৌধ, ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জেলায় জেলায় মিউজিয়াম পাঠাগার গড়ে তোলা হবে।

১৫.৩। শিক্ষা পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও আদর্শ যুক্ত করতে হবে।

১৬। নারী অধিকার, ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা

১৬.১.১। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ১৯৭৯ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা 'সিডো সনদ' (কোনো রকম সংরক্ষণ ছাড়াই), ১৯৯৩ সালে ঘোষিত ভিয়েনা সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষিত বেইজিং কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬.১.২। যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা। নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কন্যা শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬.১.৩।'পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা। 'ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড' এবং 'অ্যাভিডেন্স অ্যাক্ট'-এ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত ও দূর করা। 'অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০' সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা। 'ইকুয়াল অপরচুনিটি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা। এসব ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা।

১৬.১.৪।২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে আরো বিকশিত করা এবং তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

১৬.২। শিশু-কিশোর-যুব ও বৃদ্ধ-দুঃস্থ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

১৬.২.১। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন করা। শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন কমিশন গঠন করা।

১৬.২.২। বঞ্চিত শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

১৬.২.৩ ।পথশিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় নিশ্চিত করাসহ ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য রাত্রিকালীন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.২.৪ । শিশুদের সৃষ্টিশীল বিনোদনের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও কাঠামো গড়ে তোলা। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার করে সংরক্ষণ করা। সরকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকল এলাকায় যেন শিশুদের খেলার মাঠ থাকে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া।

১৬.২.৫ । দেশের গ্রাম ও শহরের অসহায় বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ ভাতা, আবাসন কেন্দ্র, সেনিটোরিয়াম সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

১৬.২.৬। উত্তরাঞ্চলের খরা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য ও কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৩। যুব শক্তি ও যুব সমাজ

১৬.৩.১। কর্মক্ষম সকল যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

১৬.৩.২। সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, কর্মবিহীন বেকার যুবকদের কর্মহীন সময়ে বেকার ভাতা প্রদান করা।

১৬.৩.৩। যুব সমাজকে ধ্বংসকারী মাদকাশক্তি ও মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যুব সমাজে শ্রম, মেধাকে কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

১৭। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন-সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও উন্নত আইন শৃংখলা ব্যবস্থাপনা

১৭.১। ধনবৈষম্য-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ও সামাজিক ন্যায্যতার প্রশ্নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখানো হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর আইন, প্রয়োগ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীন সক্ষমতায় দাড় করানো হবে। ঘুষ, কালোটাকা, পাচারকৃত টাকা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঋণখেলাপী, পেশী শক্তি, মাস্তানী প্রতিরোধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি নাগরিকের আয়-রোজগার ধনসম্পদ সম্পর্কে সমাজে একটি জবাবদিহি মূলক ব্যবস্থা থাকবে।

১৭.২। জনবান্ধব আইনশৃংখলা বাহিনী

চলাফেরায় ভয়-সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশ, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, সামাজিক শৃংখলা রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর একটি জনবান্ধব পুলিশী ব্যবস্থাসহ উন্নত আইনশৃংখলা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। দলীয় রাজনীতির বাইরে আইনের শাসন কার্যকর করার লক্ষে ঐ বাহিনী কাজ করবে। পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জীবনমান উন্নয়নে তাদের পরিবারের কল্যাণে রেশন, ভাতা, চিকিৎসা, শিক্ষা,

আবাসনসহ সকল রকমের মানবিক সুবিধাদি প্রদান করা হবে। পুলিশ প্রশাসনকে জনকল্যাণমূখী করে উপনিবেশিক করা থেকে বের করে পূর্ণ সংস্কার করতে হবে।

১৭.৩। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাধাহীন তথ্য প্রবাহ

১৭.৩.১। সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতি অব্যাহত রাখা, তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭.৩.২। তথ্য কমিশনকে প্রতি মুহূর্তে যুগোপযোগী করে তোলাসহ তথ্য কমিশনে জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখা।

১৭.৩.৩। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সামাজিক গণমাধ্যম, ব্যক্তিগত তথ্যপ্রবাহ যেমন বেড়েছে তেমনি সামাজিক গণমাধ্যমের অপব্যাবহারও বেড়েছে। উভয় দিক বিবেচনা করে একটি গণতান্ত্রিক উন্নয়নমুখী নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৭.৩.৪। সংবাদপত্রকে একটি শিল্প হিসেবে ঘোষণা সহ প্রয়োজনে প্রণোদনা দেওয়া হবে। কমিউনিটি রেডিও ধারণাকে বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ উন্নয়নে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

১৮। জলবায়ু পরিবর্তন : পরিবেশ পানি সম্পদ, বনাঞ্চল, হাওড়-বাওড় বিল সংরক্ষণ

১৮.১.১। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সীমাহীন মুনাফার মনোবৃত্তি বিশ্বজুড়ে কার্বন নি:স্বরণ বাড়িয়ে চলেছে। যার পরিণতি 'জলবায়ু পরিবর্তন' সংঘটিত হচ্ছে। আর এর অভিঘাত সব দেশে পড়লেও গরিব দেশগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছে, সেই কারণে বৈশ্বিক জলাবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত কিওটো প্রটোকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.১.২। পরিবেশ আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং পানি, মাটি ও বায়ু দূষণের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.১.৩। বন উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী ভরাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮.১.৪। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। বৃক্ষহীন বনাঞ্চলের পুনর্বাসন করা। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে জোরদার করা সহ দেশজ ফলজ বৃক্ষ, বনজ বৃক্ষ বাজাড়াতে হবে। ক্ষতিকর বিদেশী গাছ নিধন করা।

১৮.১.৫। ভৈরব, কপোতাক্ষ, শালতা ও বেতনা নদের পলি অপসারণ এবং ভবদহ সমস্যা সমাধান, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮.১.৬। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা ও কর্ণফুলীসহ গুরুত্বপূর্ণ নদনদীর নাব্যতা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ, খাল, পুকুর ও শহরের উন্মুক্ত স্থানগুলো সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

১৮.২। সামাজিক সুরক্ষা ঃ হাওড়-বাওড় চরাঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল, নদী ভাঙ্গন, চা শ্রমিক, হৃতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার নীতি বস্তবায়ন

১৮.২.১। সংখ্যাগরিষ্ঠ হত দরিদ্র জনগণ হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল বাস করেন, এছাড়াও শহরের ভাসমান বস্তিবাসী, নদী ভাঙ্গনের শিকার মানুষ, পশ্চাৎপদ চা শ্রমিক নানাভাবে দেশের উন্নয়নে, উৎপাদনে ভূমিকা রাখলেও তারা প্রতিমুহূর্তে মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশের ফসল, ভূমি ব্যবস্থাপনার ও ইনফরমাল সেক্টরের কাজের বৈচিত্রময়তাকে খেয়ালে নিয়ে ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়ে আসতে হবে। ঐ সকল এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ দফতর, উপ-দফতর পরিদপ্তর গঠন করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

১৮.৩। অভিবাসী শ্রমিক স্বার্থ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রবাসী কল্যাণ দক্ষ ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়ন

১৮.৩.১। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমজীবি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ দেশের বাইরে কর্মরত আছেন। বিরাট অংকের রেমিট্যান্স তারা দেশে পাঠাচ্ছেন। এই অভিবাসি শ্রমিকদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের পাঠানো অর্থের উপরে দাঁড়িয়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলা এবং অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ করা।

১৮.৩.২। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় অভিবাসি শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ বিবেচনায় সকল রকমের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৮.৩.৩। জনশক্তি মন্ত্রণালয় বেসরকারি জনশক্তি প্রতিষ্ঠান সমূহের দালালি দুর্নীতি বন্ধ সহ সরাসরি জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিদেশ পাঠানো স্বল্পমূল্যে সহজ সরল পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে।

১৮.৪। দারিদ্র্য বিমোচন ও সমবায় নীতিমালার কৌশল বাস্তবায়ন

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সংবিদানে অনুসারে দেশের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনকে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবেন। যাতে দ্ররিদ্র জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপনে উন্নয়ন অর্জন করার সুযোগ থাকে। এ লক্ষ্যে সমবায় দপ্তরগুলিকে অধিকতর সক্রিয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা হবে।

১৯। জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি

১৯.১.১। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে যেমন শক্তিশালী রাখতে হবে। তেমনি দেশের সকল নাগরিককে বহি:শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় জাতীয় সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১৯.১.২। সামরিক বাহিনীকে জনগণের মিত্রবাহিনী হিসাবে ভাবদর্শগতভাবে, মতাদর্শগতভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ হবে।

১৯.১.৩। তিন বাহিনী (স্থল, নৌ, বিমান) পরিপূর্ণভাবে সমন্বিত করে আধুনিক দক্ষ প্রশিক্ষিত বাহিনী হিসেবে প্রতিনিয়ত যুগোপযোগি করতে হবে।

১৯.১.৪। প্রতিরক্ষা বাহিনী অবশ্যই সংবিধানের অধীনস্থ হয়ে কাজ করবে। বাহিনীর নিজস্ব শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

১৯.২। জাতীয় পররাষ্ট্র নীতি

সংবিধানের ২৫ বিধি অনুসরণ করে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা, জাতিসংঘের সদস্যদের মূলনীতি মেনে চলা। জাতিসংঘের সম্মতি ব্যতিত কোন সামরিকজোটভূক্ত না হওয়া । "শত্রুতা নয় সকলের সাথে বন্ধুত্ব" এই নীতির ভিত্তিতে চলা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার করা। প্রতিটি রাষ্ট্র-জাতি নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা। প্রতিবেশী দেশসমূহ তথা ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপালের সংগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ সহ, রোহিঙ্গা শরনার্থী ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উদ্যোগ জোরদার করা। মায়নমারের উপর আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

২০। জাতীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন

২০.১.১। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও জনসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি জাতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদি সংস্থার ব্যবস্থাপত্রের বদলে জনপ্রতিনিধি ও জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা নির্ভর জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২০.১.২। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত

করার স্বার্থে অনগ্রসর এলাকা এবং প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ রাখা। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি নীতি প্রণয়ন করা। বিশ্ববাজারের অসম প্রতিযোগিতার মুখে জাতীয় শিল্প-কারখানার স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করা।

২০.১.৩। ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা। রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে ব্যক্তিখাতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের শিল্প-ব্যবসার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সহায়তা প্রদান করা। উৎপাদন ও সেবামূলক খাত বিকাশের স্বার্থে ব্যক্তি, সংহতি-সমবায় ও অন্যান্য মিশ্র খাতকে সহায়তা প্রদান করা। প্রবাসীদের অর্জিত আয়-উপার্জনকে দেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০.১.৪। মাথাভারী প্রশাসনসহ সকল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হ্রাস করা। জাতীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এ ধরনের পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়, এমন পণ্যের ও বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা।

২০.১.৫। এনজিও কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছ জবাবদিহিতার জায়গা আরো জোরদার করতে হবে। এনজিওর মাধ্যমে টাকা পাচার, দুর্নীতি, বন্ধসহ জঙ্গি তৎপরতা, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের পৃষ্টপোষক সহযোগী কর্মতৎপরতা শক্ত হাতে দমন করতে। দুর্নীতিগ্রস্ত এনজিওদের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে।

২০.১.৬। দেশের বিত্তবানদের জন্য কর বেয়াত প্রদান বন্ধ করে তাদের ওপর প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি ও তা নিশ্ছিদ্র আয় নিশ্চিত করা। বাজেটে সাধারণ জনগণের ওপর আরোপিত পরোক্ষ করের অনুপাত হ্রাস করা।

২০.১.৭। জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে সকল প্রকার স্বার্থ নিশ্চিত করে সকল পর্যায়ে আঞ্চলিক উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম এর সংগে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ) এশিয়া কো অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি) এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম) সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮ ইত্যাদি ফোরামগুলিকে উদ্যোগী করতে হবে। বিসিআইএম (বাংলাদেশ চায়না-ইন্ডিয়া-মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোরের উদ্যোগ সমূহ সক্রিয় থাকতে হবে।

২১। জাতীয় অর্থনীতি স্বার্থ ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনা

২১.১.১। বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মায়ানমারের সংগে সমুদ্রসীমা ভাগাভাগির পর একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সমগ্র সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত

করতে হবে। 'নীল অর্থনীতি'র প্রস্তাবনা স্বাপেক্ষে ঐ অঞ্চল থেকে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা সম্ভব ও সেই লক্ষ্যে সমুদ্র অঞ্চল সুরক্ষা সহ সামুদ্রিক সম্পদ, মৎস সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দক্ষ জনবল, সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহ, সমুদ্রসীমা রক্ষায় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে হবে। নীল অর্থনীতির ধারণাকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

২১.১.২। জাতীয় সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষায় দেশজ উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ

২১.১.৩। লুটেরা পুজিবাদী অর্থনীতি, লুটেরা শাসক গোষ্ঠী, ব্যক্তি গোষ্ঠীগত স্বার্থে দেশীয় খনিজ সম্পদ সহ জাতীয় সম্পদ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। যে কোন মূল্যে এই প্রবণতা রুখতে হবে। তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্দর ইত্যাদি জাতীয় সম্পদগুলি দেশীয় পরিকল্পনায় জনস্বার্থে ব্যবহারের কৌশল নীতিমালায় জনগণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করতে হবে। জাতীয় তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষার আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের পক্ষের পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি হচ্ছে ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষের পার্টি। সর্বোপরি ওয়ার্কার্স পার্টির আছে সুনির্দিষ্ট, আদর্শভিত্তিক ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি। ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীগণ নির্বাচনে বিজয়ী হলে উপরে উল্লেখিত কর্মসূচি সংসদের ভিতরে বাইরে লড়াই করবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সরকার যাতে গঠিত হতে পারে সেজন্য ভূমিকা রাখবে এবং শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কণ্ঠকে সোচ্চার করবে সংসদের ভিতরে ও বাইরে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ই-মেইল: wpartymail@gmail.com